ISSN 2521-3024

সোশ্যাল এওয়্যারন্যাস প্রোগ্রাম ফর অল (সাপা)-এর মুখপত্র

সচেতন বার্তা

৩য় বর্ষ ◻ ১২তম সংখ্যা ◻ ডিসেম্বর ২০১৮

এ সংখ্যায় যারা লিখেছেন

■ **Methodology-র সত্য-মিথ্যা**
অধ্যাপক মো: আব্দুল মান্নান

■ **গবেষণাকর্মে তথ্য নির্দেশিকার গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তা ও ধরন**
অধ্যাপক ড. নইম সুলতান

■ **কৃষি ও নারী**
কৃষিবিদ এস.এইচ.এম. গোলাম সরওয়ার

Methodology-র সত্য-মিথ্যা*

অধ্যাপক মো: আব্দুল মান্নান

আপনার গবেষণায় কী Methodology প্রয়োগ করেছেন? এরূপ জিজ্ঞাসা করা একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। হয়তো প্রশ্নকর্তাও জানেন না, Methodology আসলেই কী কিংবা জানলেও অস্পষ্ট বা খন্ডিত। আর উত্তরদাতার পক্ষে এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন ব্যাপার। কারণ প্রশ্নকর্তা Methodology বলতে কী বুঝেন সেটিই উত্তরদাতাকে প্রথমে বুঝতে হবে। এজন্য এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে সাধারণত বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং অনেক কিছুই এলোমেলো হয়ে যায়। তাছাড়া Methodology-র ছোট-খাট অথচ অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কেও রয়েছে অস্পষ্টতা, দ্ব্যর্থতা, প্রয়োগে বহুমুখিতা ইত্যাদি ধরনের বাস্তব সমস্যা। তবে Methodology বলতে যদি কোন অনুসন্ধান, বিশেণ্ডষণ ও উপসংহারে উপনীত হওয়ার সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে বুঝায় তাহলে Methodology সংক্রান্ত অনেক প্রশ্ন ও উত্তরই সহজ ও সঠিক হয়। What is the process of research? এ প্রশ্নের উত্তরই হচ্ছে Methodology; তবে খন্ডিত নয়, সামগ্রিক। বলতে হবে the entire process of a study সম্বন্ধে। আর research বলতে অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও উপসংহারে উপনীত হওয়াকে (hypothesis testing) বুঝায়।

Methodology ছাড়া কি গবেষণা করা সম্ভব নয়? এমন প্রশ্ন প্রায়ই শোনা যায়, এমন অনেক গবেষক আছেন যারা Methodology জানেন না এবং Methodology নামটিও উচ্চারণ করেন না; তবুও তারা অনেক ক্ষেত্রেই ভাল গবেষণা করে থাকেন। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও common sense প্রয়োগ করে তারা তা করেন এবং সফলও হতে পারেন। কারণ বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ মানুষের common sense এর সাথে বিজ্ঞানের তথা বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার পার্থক্য খুব কম থাকে। Methodology বহু বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ মানুষের দ্বারা উদ্ভাবিত পরীক্ষিত পদ্ধতি যা যথাযথভাবে ব্যবহার করলে গবেষণায় সঠিক ফলাফল পাওয়া সম্ভব হতে পারে। তবে গবেষণার ফলাফলের সঠিকতার জন্য কেবল Methodology-ই নয় বরং অন্যান্য উপাদানও জড়িত। Methodology গবেষককে সঠিক ও উপযুক্ত প্রক্রিয়া দিতে পারে, গবেষণার সীমা নির্ধারণ করে দিতে পারে যা থেকে কিছু বাদ দিলে প্রয়োজনীয় অংশ বাদ দেয়া হবে এবং যার বাইরের বিষয়বস্তু অন্তর্ভূক্ত করলে অপ্রয়োজনীয় অংশ অন্তর্ভূক্ত করা হবে। সর্বোপরি Methodology দক্ষ-অভিজ্ঞ গবেষক ও তাত্ত্বিকদের দ্বারা বিভিন্ন স্থান-কাল-পাত্রে প্রয়োগকৃত পরীক্ষিত কলাকৌশল যা গবেষকগণ অনুসরণ করে থাকেন।

কিছু সাধারণ নিয়মকানুন, কলাকৌশল ও পদ্ধতি আছে যেগুলো সব ধরনের গবেষণাতেই কমবেশি প্রয়াগ করা যায়। তবে প্রতিটি গবেষণাতেই কিছু স্বকীয়তা (pecularities) বৈচিত্র্য বিদ্যমান। এর কারণ হচ্ছে, দেশ, জাতি, গবেষণা এলাকা, গবেষণার সময়কাল, গবেষণার সমগ্রক/ সম্প্রদায় (community under research), গবেষণার বিষয়, গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্য। এসবের কারণে একই methodology হুবহু সকল গবেষণাতে প্রয়োগ করা যায় না। বাস্তবে কিছু কিছু কৌশল কাট-ছাট করে বা

উপযোগী করে প্রয়োগ করা হয় এবং কিছু নতুন কৌশল গবেষণার চাহিদার প্রয়োজনে প্রয়োগ করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে পাশ্চাত্যের সমাজ অধ্যয়নের লক্ষ্যে উদ্ভাবিত প্রশ্নপত্র বা সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অনুন্নত রক্ষণশীল সমাজ অধ্যয়নের সকল ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না। যেমন-যৌন সম্পর্কের মত একটি গোপন বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে গবেষককে হয়তো এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হতে পারেঃ আপনি কতজন মানুষের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছেন? পাশ্চাত্যের সমাজে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া গেলেও বাংলাদেশের মত সমাজে নারী তো দূরের কথা এমনকি পুরুষের নিকট থেকেও এর সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশে গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করতে হলে গবেষককে নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে যা এদেশের সংস্কৃতি উপযোগী। এমন আরো অনেক বিষয়ই আছে যেগুলো পাশ্চাত্যের methodology দ্বারা অধ্যয়ন করা যায় না বরং এজন্য প্রয়োজন উন্নয়নশীল সমাজের বাস্তব অবস্থার উপযোগী কলাকৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগ। প্রকৃতপক্ষে methodology এক ধরনের সংস্কৃতি (methodology is a culture) যা মনে রেখেই গবেষণাকর্ম পরিচালনা করতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলছিলাম, বিভিন্ন ক্ষেত্রে Methodology-র বহুমুখী প্রয়োগ বিষয়টিকে দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয় ও অপ্রয়োগযোগ্য করে তোলে। লক্ষ লক্ষ গবেষণার বিষয়, লক্ষ লক্ষ ধরনের ভিন্নতা, লক্ষ লক্ষ ধরনের প্রয়োগ– এসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বজনগ্রাহ্য methodology-র অস্তিত্ব থাকে না। আর ভিন্ন ভিন্ন গবেষণার জন্য ভিন্ন ভিন্ন methodology-র প্রয়োগ মূলত সর্বজনীন methodology না থাকারই নামান্তর। এজন্য মনে করা হয়, বাস্তব জগতে methodology বলে কিছু নেই। কিন্তু তা-ই যদি হয় তাহলে এমন অগ্রসরমান ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিকে একবারে অস্বীকার করা হয় যা বাস্তবসম্মত নয় এবং উচিতও নয়। প্রকৃতপক্ষে methodology-র সীমাবদ্ধতা, প্রয়োগযোগ্যতা ও উপযোগিতার দিকগুলো ভালোভাবে বুঝেই তা ব্যবহার করতে হয়।

methodology সম্পর্কে সংশয়বাদী গ্রুপ আছে যারা মনে করেন যে, সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ে ..... methodology অনুসরণ করে পরিচালিত গবেষণা সঠিক ফলাফল দিতে পারেনা। এদের মধ্যে কেউ কেউ methodology-কে একবারে পরিত্যাগ করেন এবং methodology-বিরোধী মনোভাব পোষণ করেন। আবার কেউ কেউ নিজের মনগড়া বা loose ধরনের methodology প্রয়োগ করেন যেটাকে informal methodology নামে অভিহিত করা যায়। এ ধরনের methodology-র সাধারণত সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি ও কাঠামো থাকে না বরং তা গবেষকের চিন্তা-ভাবনা ও প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে। এই গ্রুপের যুক্তি হচ্ছে, বিদ্যমান methodology-র পদ্ধতিগত অনমনীয়তা ও আনুষ্ঠানিকতার বাড়াবাড়ির ফলে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করা যায় না বরং তা methodology- প্রধান গবেষণায় পরিণত হয়। এ ধরনের যুক্তির যথার্থতা রয়েছে এবং গুণাত্মক গবেষণার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ ধরনের কৌশল বেশ সফলতাও লাভ করে। তবে এ ধরনের informal methodology-ও বিদ্যমান methodology-র বাইরে নয় বরং কোনো না কোনো পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত বা কাছাকাছি। তাছাড়া এ ধরনের গবেষণায় গবেষকের subjectivity বাস্তবে methodology-র অস্তিকেই অসম্ভব করে তোলে।

যে গ্রুপটি methodology- কে অকার্যকর ও অর্থহীন মনে করে পরিত্যাগ করেন তাদেরও নিজস্ব যুক্তি আছে। সম্ভবত তারা মনে করেন, সামাজিক বিষয়াদির গবেষণায় methodology প্রয়োগ করে বাস্তব সত্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়, বিশেষ করে গুণাত্মক বিষয়াদির। তাদের প্রধান অভিযোগ হচ্ছে, পদ্ধতিগত ও পরিসংখ্যানিক কলাকৌশল গুণাত্মক সামাজিক বিষয়াদির গবেষণায় প্রয়োগ করলে অবাস্তব ও বিকৃতি তথ্য পাওয়া যেতে পারে। এ কথা সত্য যে, সামাজিক গবেষণায় কোনো পদ্ধতিই শতভাগ বাস্তবতা উদ্‌ঘাটন করতে পারেনা বরং কতটা সত্যের কাছাকাছি (approximate to reality) নিয়ে যেতে পারে সেটাই বড় কথা। মনে করা হয় যে, methodology অনুসরণ করে পরিচালিত গবেষণা সত্যের সবচেয়ে বেশি কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে। সম্ভবত সংখ্যায়ন (quantification) সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা এই গ্রুপটিকে methodology-র প্রতি অবিশ্বাসী হতে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করেছে। কোনো তথ্যসারির বিশ্লেষণ বা এতে পরিসংখ্যানিক ফর্মুলা প্রয়োগ .....

মারাত্মক ভ্রান্তির জন্ম দেয়। বিষয়টিকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে উক্ত তথ্যসারির উৎপত্তি হল কীভাবে। যেমন, এক কেজি চাল ও মধ্যম সংস্কৃতির একজন মানুষ বুঝাতে উভয় ক্ষেত্রেই একটি সংখ্যা বা একটি টালি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এ দুটির মধ্যে একটি সংখ্যাত্মক এবং অন্যটি গুণাত্মক বিষয়। কাজেই দুটিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বুঝতে হবে এবং ভিন্নভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এরূপ পার্থক্য না বুঝে সংখ্যা দুটিকে ব্যবহার করা সঠিক নয়। তাছাড়া methodology-র প্রয়োগ একটি সামগ্রিক ব্যাপার– এর খন্ডিত, ভ্রান্ত ও অসামঞ্জস্য প্রয়োগ ভ্রান্ত চিত্র দেওয়াই স্বাভাবিক। এরূপ অবস্থায় methodology-র ওপর দোষ চাপিয়ে তা পরিত্যাগ করা সঠিক নয়।

যে কোনো গবেষণাকর্ম গবেষণার পরিকল্পনা (research planning) দিয়ে শুরু হয়। প্রথমেই নির্বাচন করতে হয় গবেষণার বিষয় (research topic) যা প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী পর্যায়সমূহের প্রকৃতি নির্ধারণ করে। নবাগত গবেষকগণ প্রায়ই গবেষণা বিষয়ের দুষ্প্রাপ্যতার সম্মুখীন হন। ফলে যেন-তেন একটি বিষয়কে গবেষণার জন্য বাছাই করেন যা বাস্তবে গবেষণাযোগ্য (researchable) নয় এবং তা কারো জন্যই তেমন কল্যাণকর নয়। তাহলে গবেষণার জন্য সঠিক, সুন্দর ও উপযুক্ত বিষয় কোথায় পাওয়া যাবে? এ প্রসঙ্গে কতিপয় উৎসের উল্লেখ করা যেতে পারে: (১) সেকেন্ডারি লিটারেচার (২) তত্ত্বাবধায়ক (৩) গবেষণায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজন; (৪) গবেষণা পদ্ধতির (methodology) ক্লাশসমূহ (৫) পূর্ববর্তী গবেষণায় উদ্ভাবিত গবেষণার বিষয়বস্তুসমূহ; (৬) পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা; (৭) প্রজ্ঞা/সৃজনশীলতা। গবেষণার বিষয় বাছাই করার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বিবেচনা করতে হয় সেগুলো হল: (১) নির্দিষ্ট সময় ও সম্পদে গবেষণাকর্ম সম্পাদনযোগ্য কি-না; (২) তথ্য পাওয়া যাবে কি-না; (৩) গবেষণার বিষয়ের প্রতি গবেষকের ব্যক্তিগত আগ্রহ আছে কি-না; (৪) গবেষণার ফলাফলের প্রতি অন্যদের আগ্রহ আছে কি-না; (৫) বিষয়াদি পান্ডিত্যপূর্ণ জার্নালে প্রকাশযোগ্য কি-না বা কোনো পরীক্ষা কমিটির নিকট আকর্ষণীয় কি-না; (৬) গবেষণাকর্মটি কোনো শূন্যতা পূরণ করে কি-না, তা নকল কি-না, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নতুন জ্ঞানের সম্প্রসারণ কিংবা উন্নয়ন করে কি-না (৭) ক্যারিয়ারের লক্ষ্য (career goals) অর্জনের সহায়ক কি-না। সাধারণত এসব বিবেচনা করেই গবেষণার বিষয় বাছাই করা হয়। তবে সকল বিষয় সমভাবে বিবেচনা করা সম্ভব হয় না বরং এক্ষেত্রে গবেষক ব্যক্তিগত প্রয়োজন, সামর্থ্য উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ রাখেন।

গবেষণার সমস্যায়ন (problemation), উদ্দেশ্য, অনুমান, চলক ও তত্ত্বের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। বাস্তবে এগুলো আন্ত:সম্পর্ক ও আন্ত:নির্ভরতা বজায় রেখে অগ্রসর হয়– কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক বিশেণ্ডষণ ও উপসংহারে উপনীত হতে সহায়তা করে। তবে এক্ষেত্রে সংখ্যাত্মক (quantitative) এবং গুণাত্মক (qualitative) গবেষণার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান যা খেয়াল রেখে অগ্রসর হতে হবে। অনেক গবেষণাতেই দেখা যায় যে, সমস্যায়ন, উদ্দেশ্য, অনুমান, চলক, ও তত্ত্ব–এ গুলোর মধ্যে সম্পর্ক থাকে না, ঐক্যতান থাকে না, এগুলো সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয় না কিংবা এসবের মধ্যে ক্ষীণ ও বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। ফলে এগুলো সমন্বিতভাবে অনুমান যাচাইকরণ বা কোনো উপসংহারে উপনীত হতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে না। এমতাবস্থায় এসব বিষয় অলংকারে পরিণত হয় মাত্র-গবেষণার প্রয়োজনে আসে না। বাস্তবে পুরো গবেষণা নকশাই (research design) সুনির্দিষ্ট বিষয়ের অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও উপসংহারে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে সমন্বিতভাবে কাজ করে- কোনো পর্যায়ে অসঙ্গতি বা বিচ্যুতি গোটা গবেষণাকেই অর্থহীন করে দিতে পারে। এজন্য গবেষণা নকশা প্রণয়নে লক্ষ রাখতে হয় যে প্রতিটি পর্যায়ের মধ্যে সংগতি-সমন্বয় আছে কি-না।

সমগ্রকের (population) সকল ইউনিটকে যদি অধ্যয়নের অন্তর্ভূক্ত করা না হয় তাহলে নমুনা (sample) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। তবে প্রশ্নকর্তা নমুনাসংক্রান্ত ব্যাপারে বিজ্ঞ না হলে মোটামুটি ধরনের একটি উত্তরেই তিনি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। কিন্তু কেবল নমুনা হিসেবে এত সংখ্যক ইউনিটকে বাছাই করা হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা

হয়েছে- এ ধরনের সহজ-সরল ও সংক্ষিপ্ত উত্তরে সন্তুষ্ট হওয়ার সংগত কারণ নেই। কেননা নমুনাজনিত ভ্রান্তির (sampling errors) কারণে গোটা গবেষণাই ভুল ও অর্থহীন হয়ে যেতে পারে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সতর্কতার সাথে নমুনা বাছাই করতে হবে। এজন্য গবেষককে গবেষণা এলাকা, সমগ্রক, সমগ্রক থেকে কী বা কী কী প্রক্রিয়ায় নমুনা বাছাই করা হল, কেন এই বা এসব প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হল- এ ধরনের বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। গবেষণা এলাকা যদি প্রতিনিধিত্বমূলক (typical) না হয় তাহলে গবেষণায় সঠিক ফলাফল পাওয়া যাবে না। যেমন, আমেরিকা থেকে একজন গবেষক উড়ে এসে নামলেন এবং ঢাকা শহর এলাকা জরিপ করে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, বাংলাদেশে প্রায় শতভাগ মানুষই শিক্ষিত। এরূপ ভ্রান্ত উপসংহারে উপনীত হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে গবেষণা এলাকা প্রতিনিধিত্বশীল নয়। আবার অনেকেই সমগ্রক (population) এবং জনসংখ্যার (population) মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। জনসংখ্যাকে সমগ্রক হিসেবে বিবেচনা করে গবেষণা পরিচালনা করলে সঠিক ফলাফল পাওয়া যাবে না।

অনেক গবেষণাকর্মেই অধ্যায় বিন্যাসে (Chapter Design) সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অনুসরণ ও পরিকল্পনার অভাব লক্ষ করা যায়। প্রায়ই গবেষকরা মনগড়া, অযৌক্তিক ও উদ্দেশ্যহীন অধ্যায়সমূহ সংযোজন করে থাকেন। এরূপ অধ্যায় বিন্যাস, গবেষণার বিষয়বস্তু, লক্ষ্য, অনুমান, চলক, তত্ত্ব- এগুলোর সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। কাজেই এরূপ গবেষণাকর্ম অনেক কিছু নিয়েই হয়তো অধ্যয়ন করে তবে তা গবেষণায় নির্ধারিত বিষয় নিয়ে যথাযথ অধ্যয়ন করতে পারে না। এজন্য অধ্যায় বিন্যাস অবশ্যই গবেষণার লক্ষ্য, অনুমান, চলক, তত্ত্ব- এগুলোর সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। বাস্তবে এগুলোই গবেষককে অধ্যায় বিন্যাসের ক্লু বা ইঙ্গিত প্রদান করে যা গবেষককে অনুসরণ করতে হয়। যদি বলা সম্ভব হয় যে গবেষণার অমুক উদ্দেশ্য বা অনুমান অমুক অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়। এজন্য নবাগত গবেষকদের প্রায়ই প্রশ্ন করা হয়ঃ কোন উদ্দেশ্য বা অনুমান কোন অধ্যায়ে আলোচনা করা হযেছে? অধ্যায় বিন্যাসে গবেষকগণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সম্মুখীন হনঃ সাহিত্য পর্যালোচনা এবং গবেষণা এলাকা দুটি পৃথক পৃথক অধ্যায়ে হবে না-কি "ভূমিকা" বা "গবেষণা পদ্ধতি" অধ্যায়ের অর্ন্তভূক্ত হবে। এ প্রশ্নের সহজ-সরল ও সঠিক উত্তর হলঃ যেসব গবেষণার বিষয়ের উপর ব্যাপক সংখ্যক সেকেন্ডারি লিটারেচার রয়েছে সেসব গবেষণায় সাহিত্য পর্যালোচনা পৃথক অধ্যায় হিসেবে সংযোজন করা উচিৎ। অন্যদিকে গবেষণার বিষয় যদি নতুন ধরনের হয় এবং এসবের ওপর যদি ব্যাপক সংখ্যক সেকেন্ডারি লিটারেচার না থাকে তাহলে সাহিত্য পর্যালোচনার ওপর পৃথক অধ্যায় করার প্রয়োজন নেই। গবেষণা এলাকার ওপর পৃথক অধ্যায় করা হবে কি-না সে সম্পর্কে বলা যায় যে, গবেষণার ফলাফলের ওপর গবেষণা এলাকার বৈশিষ্ট্যসমূহের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব থাকলে গবেষণার এলাকা- সম্পর্কিত একটি পৃথক অধ্যায় সংযোজন করাই বাঞ্ছনীয় যাতে গবেষণা এলাকাকে পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপন করা যায়।

সামাজিক গবেষণা সম্পাদনের ক্ষেত্রে আমরা কি common sense না-কি methodology এর ওপর নির্ভর করব- এ প্রশ্ন খুবই মৌলিক। common sense প্রয়োগ করে কাকতালীয়ভাবে কোনা কোনো ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া গেলেও তা সকল ক্ষেত্রে সুফল প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেয় না। কারণ তা দীর্ঘ অভিজ্ঞতালব্ধ প্রায়োগিক জ্ঞান বা কৌশল নয়। এজন্য গবেষকদের অত্যাবশ্যকীয়ভাবে methodology এর ওপর নির্ভর করতে হয়। methodology সঠিক পথ দেখায়, সংকট উত্তরণে সহায়তা করে এবং অনুসন্ধানীয় বিষয় সম্পর্কে সঠিক ফলাফল প্রদান করে। কাজেই আমি মনে করি, methodology এর ন্যূনতম জ্ঞান-গরিমা অর্জন ব্যতীত সামাজিক গবেষণা সম্পাদন করা স্থাপত্য বিদ্যা অর্জন ব্যতীত স্থাপত্য কর্ম নির্মানের মতো।

অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

*জিজ্ঞাসা (এমফিল ও পিএইচডি গবেষণা কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন), সংখ্যা-১, জুন ২০১৩, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-য় প্রকাশিত। লেখক ও সম্পাদকের অনুমতিক্রমে পুনরায় প্রকাশিত হল।

গবেষণাকর্মে তথ্য নির্দেশিকার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও ধরন*

অধ্যাপক ড. নইম সুলতান

তথ্য নির্দেশিকা যে কোনো academic research এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় অংশ। তথ্য নির্দেশিকা ব্যতীত কোনো গবেষণাকর্ম অসম্পূর্ণ থেকে যায়। গবেষণাকর্মে একজন গবেষক সঠিক তথ্য প্রদান করেছেন কিনা, তা পরিস্ফুটিত হয় তথ্য নির্দেশিকার মধ্য দিয়ে। সঠিক তথ্য নির্দেশিকার প্রদান এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে এর মধ্য দিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রকাশ পায় তা হল, (ক) বুদ্ধিবৃত্তিক সততা (খ) গবেষক সঠিক তথ্য উপস্থাপন করেছেন কিনা এবং সেই তথ্যে যে ধারণা দেওয়া হয়েছে তা সঠিক কি না তা বোঝা (গ) গবেষক যে তথ্য উপস্থাপন করছেন তা তার যুক্তিকে সমর্থন করে কিনা সেটি বোঝা এবং (ঘ) গবেষক যে তথ্য ব্যবহার করেছেন সে তথ্য গ্রহণযোগ্য ও যথার্থ কিনা সেটি বোঝা। এছাড়াও গবেষকের সঠিক তথ্য নির্দেশিকা প্রদান করা প্রয়োজন এই জন্য যে, গবেষক যার বা যে প্রতিষ্ঠানের তথ্য ব্যবহার করছেন তাকে বা সেই প্রতিষ্ঠানকে সম্মান প্রদর্শন করা এবং যাতে plagiarism না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকা। একটি গবেষণায় গবেষক যদি ইচ্ছেমত তথ্য নিজে সৃষ্টি করে উপস্থাপন করেন তবে সেটি কোনো গবেষণাকর্ম হবে না। এই ধরনের গবেষণাকর্ম হবে অসৎ গবেষণাকর্ম, যা প্রকৃত তথ্য তুলে ধরবে না। কাজেই একটি গবেষণায় গবেষক যে তথ্য উপস্থাপন করছেন সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য নির্দেশিকা থাকা প্রয়োজন। একারনেই যে কোনো গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে সঠিক তথ্য নির্দেশিকা প্রদান করা।

গবেষক বিভিন্ন মাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তা তার গবেষণায় উপস্থাপন করতে পারেন। গবেষক যে তথ্য উপস্থাপন করছেন, সেটি যেমন প্রকাশিত উৎস হতে পারে আবার অপ্রকাশিত উৎস হতে পারে। এছাড়াও গবেষক বিভিন্ন উৎস, যেমন- ওয়েবসাইট, পত্র-পত্রিকা, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, চলচ্চিত্র, নাটক কিংবা কোনো বক্তৃতা বিবৃতি থেকেও তথ্য প্রদান করতে পারেন। তথ্য নির্দেশিকা এখানে এই জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে এর মাধ্যমে একজন পাঠক বুঝতে পারেন যে গবেষক কোন মাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তথ্য নির্দেশিকা যদি সঠিকভাবে প্রদান করা না হয় তবে উক্ত উৎস উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হবে না। তাই গবেষণায় সঠিকভাবে তথ্য নির্দেশিকা প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন। যে সমস্ত গবেষক গবেষণার মাধ্যমে অভিসন্দর্ভ রচনা করেন, তাদের সঠিক তথ্য নির্দেশিকা প্রদানের প্রতি গুরুত্ব দেয়া একান্ত প্রয়োজন।

তথ্য নির্দেশিকা প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধরন রয়েছে। এই ধরনগুলো হল (ক) Oxford Style (খ) Harvard Style (গ) ASA (American Sociological Association) (ঘ) APA (American Phychology Association) Style (ঙ) Chicago Citation Style (চ) Vancouver Referencing Style ইত্যাদি। একজন গবেষককে একটি গবেষণাকর্মে যে কোনো একটি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। একই গবেষণায় একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার সঠিক নয়।

তথ্য নির্দেশিকা প্রদানের দুটি পদ্ধতি আছে। একজন গবেষককে যে কোনো একটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। এই পদ্ধতি দুটি হল (ক) Vancouver Style (খ) Parenthetical Referencing।

একজন গবেষক দুটি প্রক্রিয়ায় তথ্য নির্দেশিকা প্রদান করতে পারেন। একটি হল Footnote প্রক্রিয়া এবং অপরটি হল Endnote প্রক্রিয়া। Footnote প্রক্রিয়ায় গবেষণার প্রতি পৃষ্ঠার নীচে তথ্য নির্দেশিকা প্রদান করতে হয়। অপরপক্ষে Endnote প্রক্রিয়ায় গবেষণার শেষে এসে তথ্য নির্দেশিকা দেয়া হয়। এই ক্ষেত্রেও গবেষককে যে কোনো একটি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

একজন গবেষকের এ বিষয়টিও খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে, তথ্য নির্দেশিকা (Reference) ও গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography) একই বিষয় নয়। তথ্য নির্দেশিকা হচ্ছে গবেষক তার গবেষণায় যে তথ্য প্রদান করেছেন সে বিষয়টিকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা। অপরপক্ষে গ্রন্থপঞ্জি হল গবেষকের গবেষণা সংক্রান্ত সহায়ক গ্রন্থ, প্রবন্ধ কিংবা অন্যান্য উৎসের একটি তালিকা। এই তালিকা থেকে পাঠক অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে। তবে তথ্য নির্দেশিকার ক্ষেত্রে Parenthetical Referencing পদ্ধতি ব্যবহার করলে নির্দেশিত তথ্যের জন্য Bibliography ব্যবহার করতে হয়।

সরকার ও রাজনীতি বিভাগে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণারত ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আবেদন থাকবে এই যে তারা যেন সঠিক তথ্য নির্দেশিকা ব্যবহার করেন। তবেই তাদের গবেষণা সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ গবেষণায় পরিণত হবে।

অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

*জিজ্ঞাসা (এমফিল ও পিএইচডি গবেষণা কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন), সংখ্যা-১, জুন ২০১৩, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-য় প্রকাশিত। লেখক ও সম্পাদকের অনুমতিক্রমে পুনরায় প্রকাশিত হল।

কৃষি ও নারী

কৃষিবিদ এস.এইচ.এম. গোলাম সরওয়ার

মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কৃষি ও খাদ্য অপরিহার্য। কৃষি বিজ্ঞান অতি প্রাচীন যা মানব জাতির সৃষ্টি ও বসবাসের সময় থেকেই ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। কৃষির উৎপত্তি কোথায়, কখন, কিভাবে হয়েছিল? এ বিষয়ে হয়তো অনেকের ধারনা নেই। কৃষির উৎপত্তি নিয়ে নানা মতভেদ থাকলেও নারীর ভূমিকা শীর্ষে। এ বিষয়ে অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই। মানুষ সৃষ্টির পর থেকে আধুনিক যুগকে ঐতিহাসিকগণ প্রধানত পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন, যেমন-

(১) আদিযুগ ঃ এ যুগে মানুষ বনে-জঙ্গলে, মাটির গর্তে, বৃক্ষের কোঠরে ও গাছের ডালে বসবাস করত। খাদ্যের সন্ধানে তারা বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত এবং লতা-পাতা, ফল-মূল খেয়ে জীবন যাপন করতো। বাড়ী ঘর তৈরী ও আগুন জ্বালানোর জ্ঞান-বুদ্ধি তাদের ছিলনা। তারা যাযাবরের মত জীবন যাপন করতো।

(২) পুরাতন প্রস্তর ও শিকার যুগ ঃ এ যুগের মানুষ পাথর দ্বারা হাতিয়ার তৈরি করতে শিখে। এ হাতিয়ার দিয়ে তারা বন্য পশু শিকার করে কাঁচা মাংস খেত। তবে হাতিয়ারগুলো ধারালো ও এত উন্নত ছিলনা। এযুগেও মানুষ যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াত।

(৩) নতুন প্রস্তর ও অগ্নি যুগ ঃ এ যুগে মানুষ উন্নত হাতিয়ার তৈরী ও আগুন জ্বালাতে শিখে। ফলে তারা সহজেই বন্য প্রাণী শিকার করে কাঁচা মাংস আগুনে ঝলসিয়ে খেত। খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে তারা এক স্থান হতে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াত।

(৪) পশু-পালন যুগ ঃ এ যুগে মানুষ পশু-পাখি, মৎস, ফল-মূল, শস্য, মিঠাপানি ইত্যাদির সন্ধানে এক স্থান হতে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াত। খাদ্যের সন্ধানে ঘোরাঘুরির সময় তারা নিরীহ বন্য প্রাণী যেমন- গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, গাধা, ঘোড়া, কুকুর, হাঁস-মুরগীসহ বিভিন্ন প্রকার পাখি আবাসস্থলে ধরে আনত। পুরুষরা পশু-পক্ষী শিকারের কাজে অধিকাংশ সময় বাহিরে থাকত। মহিলারা বাচ্চাদের প্রতি-পালন ও গৃহস্থালি কাজের জন্য আবাসস্থলে অবস্থান করত। নারীরাই প্রথম ধৃত পশু-পক্ষীগুলোকে মমতাময়ী আচরণের মাধ্যমে পোষ মানিয়ে এদের থেকে দুধ, মাংস, পশম, চামড়া, হাড়, ডিম ও পালক সংগ্রহ করত। যার ধারাবাহিকতায় এখনও গৃহপালিত পশু-পক্ষী লালন পালন হয়ে আসছে। এ যুগের মানুষরাও যাযাবরের মত এক স্থান হতে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াত।

(৫) শস্য-উৎপাদন যুগ ঃ এ যুগে মানুষরা যাযাবর জীবনের প্রতি অতিষ্ট হয়ে নিরাপদ এবং স্থায়ী আবাস্থল স্থাপনের জন্য নদী-নালার কাছে সমতল ভূমিতে স্থায়ী ঘর-বাড়ী তৈরী করে দলবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করে। পশু-পালন যুগের হাজার হাজার বছর পর এ যুগের সূচনা হয়। পুরুষ মানুষেরা পশু-পাখি শিকারের কাজে

বনে-জঙ্গলেই অধিক সময় কাটাত। মহিলারা গৃহে গৃহস্থালি কাজে ব্যস্ত থাকতো। পুরুষরা শিকারের সময় বন-জঙ্গল থেকে বিভিন্ন প্রকার ফলমূল ও শস্য সংগ্রহ করে আনত। এসকল ফলমূল বা শস্যদানা খাওয়ার পর বীজগুলো গৃহের আশে-পাশে ফেলতো। বীজগুলো মাটিতে অংকুরিত হয়ে নতুন চারার সৃষ্টি হত। প্রথম নারীরাই বীজের অংকুরোদগম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের মাধ্যমে মাটিতে বীজ পুতে চাষ-বাস শুরু করে। অর্থাৎ নারীদের মাধ্যমেই কৃষির উৎপত্তি ঘটে। বর্তমান কৃষির প্রতিটি খাত ও উপ-খাতে নারীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে ঃ

কৃষি/ফসল উৎপাদন ঃ বীজ তলা তৈরী, বীজের অংকুরোদগম, বীজ বপন, চারা উত্তোলন, চারা রোপন, আগাছা উত্তোলন/নিরানী, সেচ প্রদান, সার প্রয়োগ, ফসল কর্তন, মাড়াই, ঝাড়াই, খাদ্য-শস্য মজুদ, বীজ বাছাই, বীজ শোধন ও বীজ সংরক্ষণ কাজে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরা কাজ করে থাকেন। তবে খাদ্য শস্য ঝাড়াই, পরিস্কার ও সংরক্ষণ কাজে প্রত্যক্ষভাবে নারীরা কাজ করে থাকেন। গ্রামীণ নারীরা শাক-সবজি ও ফলমূল উৎপাদনের জন্য বাড়ির আশে পাশে ঝাংলি/মাচাতে লাউ, শসা, কুমড়া, সিম, বরবটি, চিচিংগা, ঝিংগা প্রভৃতি ফসল এবং পেঁপে, কলা, আনারস, লেবুসহ বিভিন্ন ফলদ বৃক্ষ রোপন করে থাকেন। পার্বত্য এলাকায় ঝুম চাষে নারীদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। চরাঞ্চলের নারীরা প্রত্যক্ষভাবে কৃষি কাজের সহিত সম্পৃক্ত।

পশু-পালন ঃ বাংলার নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অধিকাংশ নারী গবাদি পশুদের নিয়মিত খড়-পানি, দানাদার খাদ্য খাওয়ায় এবং এদের থেকে দুধ সংগ্রহ করেন। নিয়মিত গোয়াল ঘর পরিস্কার, গোবর ও ময়লা আবর্জনা দিয়ে জৈব সার তৈরীর কাজ করেন। দেশের অসংখ্য নারী শ্রমিক হিসেবে ডেইরী ফার্মে কাজ করেন।

পোল্ট্রি ঃ গ্রামীণ ও শহরের অসংখ্য নারী হাঁস-মুরগী, কবুতর, কোয়েল পালন করেন। পোল্ট্রি থেকে ডিম ও মাংস সংগ্রহ করে অনেক নারী অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী। হাওড় ও নদী এলাকার অসংখ্য মহিলা হাঁস পালনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেন। দেশে অসংখ্য নারী উদ্যেগক্তা রয়েছেন যাঁরা পোল্ট্রি ফার্ম, কোয়েল ফার্ম ও হাঁস খামারের মালিক।

মৎস্য চাষ ঃ অনেক এলাকার নারীরা খাঁচায় মাছ চাষ করেন। দক্ষিণ এলাকার অসংখ্য মহিলা চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষের সহিত জড়িত। আধুনিক পদ্ধতিতে ছোট পুকুর বা গর্তে মাছ চাষ গ্রামাঞ্চলে বিস্তার লাভ করছে যার প্রধান সুবিধাভোগী হলো নারী।

নার্সারী ঃ মহিলারা নার্সারীতে বিভিন্ন প্রকার ফলজ, বনজ, ঔষধী ও শেভাবর্ধক চারা উৎপাদনের সহিত জড়িত থাকেন। দক্ষ মহিলারা অর্কিড, বনসাই, ক্যাকটাস-এর মত মূল্যবান চারা উৎপাদন করেন। মাশরম চাষে মহিলাদের অবদান উল্লেখযোগ্য।

প্রক্রিয়াজাত খাদ্য প্রস্তুত ঃ জ্যাম, জেলি, জুস, সস, পটেটো চিপস, আচার, কেচাপ, আমসত্ত্ব, মিষ্টি জাতীয় খাদ্য তৈরীতে নারীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। খেজুর রসের পাটালি গুড় তৈরীতে গ্রামীণ নারীরা কাজ করেন। চিড়া, মুড়ি, মোয়া, খই, পাপর প্রভৃতি তৈরীতে নারীদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

কৃষিভিত্তিক শিল্প ঃ চাতাল, অটো-রাইস মিল, আটা-ময়দা শিল্প, বেকারি শিল্পসহ অন্যান্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্পে অসংখ্য মহিলা শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। চা বাগানে বেশিরভাগ শ্রমিক নারী। চিনি শিল্পের অধীন ইক্ষু ফার্মের প্রায় অধিকাংশই নারী শ্রমিক।

কৃষি গবেষণা ও বীজ উৎপাদন খামার ঃ কৃষি গবেষণা, ধান গবেষণা, পাট গবেষণা, গম ও ভুট্টা গবেষণা, ডাল গবেষণা, ইক্ষু গবেষণা ফার্মগুলোতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। এছাড়াও BADC-এর নিয়ন্ত্রণে বীজ ফার্মে এবং বেসরকারী বীজ উৎপাদন ফার্মগুলোতেও নারীরা শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন।

বনায়ন ঃ কৃষি বনায়ন ও সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। অসংখ্য নারী বিভিন্ন বন থেকে বৃক্ষের পাতা, ছোট শাখা-প্রশাখা জ্বালানি হিসেবে সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত আছে।

ছাদ কৃষি ঃ বর্তমানে সমাজের মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্য বিত্তরা এ কাজে এগিয়ে আসছেন। টিভি ব্যক্তিত্ব সাইখ সিরাজ একাজে মহিলাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে আসছেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শহরের মহিলারা বেশি উৎসাহিত হচ্ছেন। বাড়ির ছাদে মহিলারা বিভিন্ন প্রকার বিষমুক্ত শাকসব্জি, ফলমূল চাষ এবং পাশাপাশি হাঁস-মুরগী, কবুতর, কোয়েল পালন করছেন। নারীরা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরের বাড়ির ছাদগুলোকে সবুজায়নে রূপান্তর করছেন।

এছাড়াও নারীদের বিভিন্ন কৃষি কাজের সাথে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, যেমন- কেঁচো কম্পোষ্ট, ট্রাইকো কম্পোষ্টসার, নারিকেল ছোবড়া, লবন উৎপাদন, তুলা উৎপাদন, শুটকি মাছ, শিতল পাটি তৈরী ইত্যাদি। কুটির শিল্পেও নারীদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। এ নারী জনশক্তির প্রায় ৭০ শতাংশ কৃষি, ডেইরী, পোল্ট্রি, মৎস্য, বনায়ন খাত এবং বিভিন্ন কৃষি উপখাতের সাথে জড়িত। গ্রামীণ নারীরা প্রায় সবাই নিজের পরিবারের কৃষি ও কৃষি সংশিণ্টষ্ট কাজের সাথে জড়িত থাকেন। কৃষি জমিতে প্রত্যক্ষভাবে কঠিন ও শক্তিশালী কাজগুলো করা নারীর সংখ্যা খুব কম। তবে দরিদ্র শ্রেণির মানুষ যাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা রয়েছে তারা অন্যের কৃষি জমিতে বা কৃষি খামারে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে থাকেন। কৃষি কাজে জড়িত এ বিপুল সংখ্যক নারী শ্রমিকের তেমন কোন মূল্যায়ন হয় না। নারী কৃষি শ্রমিকরা সর্বত্র বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। একজন পুর"ষ শ্রমিকের দৈনিক মজুরির চেয়ে নারী শ্রমিকরা কম মজুরি পান। শুধু নারী হওয়ার কারণে এ বৈষম্য। মন্ত্রীসভায় ২০১১ সনে নারী উন্নয়ন নীতি অনুমোদন হয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির ৩টি ভাগে ৪৯টি অধ্যায় রয়েছে। যার মধ্যে ৩১.১-জাতীয় অর্থনীতিতে নারী কৃষি শ্রমিকের শ্রমের স্বীকৃতি প্রদান করা, ৩১.২-জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে নারী কৃষি শ্রমিকদের সবরকম সহায়তা প্রদান করা, ৩১.৩-কৃষিতে নারী শ্রমিকের মজুরি বৈষম্য দূরীকরণ এবং সমকাজে সমমজুরি নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। উল্লেখিত ধারাগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হলে কৃষি ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।

নারীর অবদান সম্পর্কে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন-

"শস্য ক্ষেত্র উর্বর হ'ল, পুরুষ চালাল হাল,
নারী সেই মাঠে শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল।
নর বাহে হাল, নারী বহে জল, সেই জল-মাটি মিশে,
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালী ধানের শীষে।"

ডেপুটি চীফ ফার্ম সুপারিনটেনডেন্ট
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।

সম্পাদকীয়

গবেষণা কোনো বিষয়ের নতুন দিক উন্মোচন করে, নতুন জ্ঞান যোগ করে এবং প্রচলিত জ্ঞানের সত্যতা যাচাই করে। গবেষণার সাহায্যে কোনো বিষয়ের বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়ন সম্ভব হয়। কাজেই বলা যায়, বৈজ্ঞানিক নীতিমালা অনুসরণ করে জ্ঞান অনুসন্ধানের পদ্ধতিই গবেষণা। গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত নতুন জ্ঞান কেবল ব্যক্তির পেশাগত মান ও দক্ষতাই বৃদ্ধি করে না বরং দেশের সুশাসন ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বর্তমান সরকার উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে গবেষণায় অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আসুন আমরা গবেষণায় মনোনিবেশ করে জ্ঞানের নতুন নতুন দিক উন্মোচন করি এবং দেশকে সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করি।

সম্পাদনা পরিষদ

ড. ফিরোজা বেগম
লেলিন আজাদ
সামসুন্নাহার মনি

লেখা আহবান

সমাজের নানা অসঙ্গতি-বৈষম্য কি আপনাকে ভাবিয়ে তোলে? আপনি কি সামাজিক কুসংস্কার ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দূর করতে বদ্ধপরিকর? আপনি কি আপনার লেখনি দ্বারা সচেতন জনসমাজ গড়ে তুলতে চান? তাহলে আপনি যেই হোন, বাংলাভাষায় প্রকাশিত সচেতনতা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা সচেতন বার্তায় লেখা পাঠাতে আজই যোগাযোগ করুন নিম্ন ঠিকানায়।

সাপা'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

আপনি কি আপনার প্রতিষ্ঠান বা ঘরে বসেই নিয়মিত ত্রৈমাসিক সচেতন বার্তা পড়তে চান? তাহলে বাৎসরিক দুইশত টাকা প্রদান সাপেক্ষে আজই গ্রাহক হোন। আমরা গ্রাহকদের নিয়মিত কুরিয়ার বা ডাকযোগে সচেতন বার্তা প্রেরণ করে থাকি। বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন নিম্ন ঠিকানায় ।

সোশ্যাল এওয়্যারন্যাস প্রোগ্রাম ফর অল (সাপা)
মধ্যেরচর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা থেকে ফজিলাতুন নেসা কর্তৃক প্রকাশিত
মোবাইল : ০১৭১৬০৫৬১৯২
ই-মেইল : apamskd@gmail.com
মূল্য : ২৫ টাকা